দলছুট

সমরেশ মজুমদার

মধ্যরাত্রে বোলপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিল যুবকটি। মাঝারি উচ্চতার রোগা শরীরে বিপুল ময়লা জিন্‌স, আর প্রায় বিবর্ণ গেঞ্জিশার্ট আলগা হয়ে আছে। মাথার উসকোখুসকো চুলগুলোকে মাঝে-মাঝেই আঙুলের শাসনে সংযত রাখছে সে। ট্রেন আসার ঘণ্টাখানেক আগে ওর শুভানুধ্যায়ী একজন জেনারেল ক্লাসের টিকিট কেটে নিয়ে গিয়েছিল। তখন সে ছিল বাস-রিকশা স্ট্যান্ডের পিছনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। টিকিট আর কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে শুভানুধ্যায়ী বলেছিল, "চুপচাপ চলে যাও। দিন দশেক পরে পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে জেনে নিয়ো এদিকের অবস্থার কথা। সাবধান, এমন কিছু কোরো না, যা দেখে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি হবে।"

শুভানুধ্যায়ী অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার দশ মিনিট পরে সে স্টেশনে ঢুকেছিল। ঢোকার মুখে কোনও চেকার না থাকায় সে আলো এড়িয়ে-এড়িয়ে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে অন্ধকারের আড়াল আছে।

তারপর ট্রেন এল হুড়মুড়িয়ে। সে ছুটল। সবই রিজার্ভড কামরা। জেনারেল কামরা, যেখানে উঠে বসলে কোনও রিজার্ভেশন চার্জ দিতে হয় না, চোখেই পড়ছিল না। ছোটাছুটি করতে-করতে ইঞ্জিনের বাঁশি জানান দিল। সে তখন যে কামরার সামনে, তার ভিতরটা প্রায় খালি। একজন মোটাসোটা মানুষ, যার পরনে হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা নীল গেঞ্জি, দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সে মরিয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "জেনারেল কম্পার্টমেন্ট কোথায় জানেন?"

লোকটি হিন্দিতে বলল, "না ভাই। এটা মিলিটারি কামরা। কোথায় যাবেন?"

ট্রেন দুলে উঠল। সে চেঁচাল, "নর্থ বেঙ্গল। খুব জরুরি।"

"আপাতত এখানে উঠে পড়ুন, পরের স্টেশনে নেমে খুঁজে নেবেন।"

লোকটার কথা শেষ হতেই প্রায় দৌড়ে কামরার হাতল ধরে উপরে উঠে এল সে। লোকটা বলল, "সাবাস। রোগা হলেও বডি ফিট আছে।"

সে মুখ ঘুরিয়ে কামরার ভিতরটা দেখল। বেশিরভাগ বার্থই খালি, বাকিরা ঘুমোচ্ছে। লোকটা দরজা বন্ধ করে বলল, "আসুন, আমার সামনের বার্থ খালি আছে। নেক্সট স্টেশন তো মালদহ, ওই অবধি বসে যান।"

যুবক সন্তর্পণে বসল। মিলিটারিদের যাওয়ার জন্য এই কামরায় সাধারণ যাত্রীদের ওঠা নিষেধ। মিলিটারিদের সঙ্গে পুলিশের অনেক পার্থক্য আছে বলে সে শুনেছে। যে কয়েকবার তাদের সঙ্গে যাদের লড়াই হয়েছে, তারা অবশ্যই মিলিটারি ছিল না।

"ভাইসাব, আপনি তখন বললেন, খুব জরুরি। কেউ কি অসুস্থ?"

"হ্যাঁ," ঝটপট কথা বানাল সে, "আমার বাবা খুব অসুস্থ।"

"ওহো! নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন উনি। আপনি কী করেন?"

বি এ পাশ করার পর কিছুদিন টিউশনি করেছিল সে। তাই উত্তরটা সহজেই জিভে এসে গেল, "মাস্টারি।"

"আচ্ছা!" লোকটি চোখ বড় করল, "এর চেয়ে বড় দেশের সেবা আর কী হতে পারে। আপনাকে আমি মাস্টারজি বলে ডাকব। আমি ছেলেবেলায় নেতাজি সুভাষ বসুর খুব ভক্ত ছিলাম। তাঁর ছবিতে ফুল দিতাম। বাবার বড় ব্যবসা ছিল। সেসবে না গিয়ে ভাবলাম দেশসেবা করব। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে মিলিটারিতে ঢুকে গেলাম। দেশ-মায়ের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করলাম," লোকটা হাসল, "আমার নাম চন্দ্রশেখর গুপ্তা।"

ট্রেন ছুটছে অন্ধকার ঘিরে। যুবকের মনে হল, এই কামরায় সে বেশ নিরাপদে আছে। পুলিশের লোকজন কখনওই সন্দেহ করবে না, নজর রাখবে না এই কামরার উপর।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার রাতের খাওয়া হয়েছে?"

যুবক হাসল, "কেন বলুন তো?"

"দেখে মনে হচ্ছে হয়নি। দাঁড়ান," চন্দ্রশেখর তার ব্যাগ থেকে বড় কৌটো বের করে দুটো রুটি আর তরকারি একটা কাগজের প্লেটে ঢেলে এগিয়ে ধরল, "মাস্টারজি, না বলবেন না, খেয়ে নিন। জল দিচ্ছি।"

দীর্ঘসময় অভুক্ত থাকায় খিদেবোধটাই চলে গিয়েছিল। তবু হাত বাড়িয়ে প্লেট নিল সে। তারপর ধীরে-ধীরে খেয়ে নিল পুরোটাই। জলের বোতল থেকে জল গলায় ঢেলে মনে হল অনেকদিন পর সে তৃপ্তি পেল। চন্দ্রশেখর তার শোয়ার চাদর আগেই বিছিয়ে রেখেছিলেন। বললেন, "মালদহ আসতে যে সময় লাগবে, তার মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।"

লোভ হচ্ছিল। কিন্তু লোকটাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়, তা বুঝতে পারছিল না সে। কামরায় তুলে, খাইয়েদাইয়ে ঘুমোতে বলছে। ঘুমিয়ে পড়লে পুলিশের হাতে যে তুলে দেবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। ট্রেনিংয়ের সময় তাদের শেখানো হয়েছিল, অপরিচিত মানুষকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করবে না। আর পরিচিত হলে, তা সে বাবা, ভাই, দাদা যেই হোক না কেন, খানিকটা দুরত্ব রেখে মিশবে। মনে রাখতে হবে বিপ্লবের শত্রুরা তোমার চারপাশে বন্ধুর মুখোশ পরে বসে আছে।

সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কতদূরে যাচ্ছেন?"

"অসম। এর আগের বার বর্ডারে ছিলাম। এবার যেতে হবে না।"

"কেন?"

"মাস্টারজি, এই জন্মভূমি, ভারত আমাদের মা। বাইরের শত্রু মাকে আক্রমণ করলে আমরা তাদের হঠিয়ে দেব। মাটি-জল-আকাশকে রক্ষা করার জন্যে তিনটে বাহিনী জেগে আছে। বাইরের শত্রু হল চিন আর পাকিস্তান। কিন্তু দেশের ভিতরে শত্রু যারা, তাদের সঙ্গে লড়াই করা খুব শক্ত ব্যাপার।"

"কেন?" সে শ্বাস চেপে জিজ্ঞেস করল।

"তারা তো আমাদের ভাই। ভারত বিরাট দেশ। কিছু লোককে ভুল বুঝিয়ে খেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে বিপ্লব করো। অল্পবয়সি ছেলেগুলো নিজের কথা না ভেবে দেশকে টুকরো করতে চাইছে। মাস্টারজি, আমার বাঁ হাত যদি বিপ্লব করতে চায়, তা হলে বাঁ পায়ের কাছে খবর পৌঁছাবে? বুঝিয়েও যখন কাজ হয় না, ওরা যখন একের পর এক মানুষ মেরে ফেলছে, তখন দেশ বাঁচাতে ওদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র চালাতে হচ্ছে," চন্দ্রশেখর শুয়ে পড়ল, "মাস্টারজি, আমরা দশ-বিশ হাজার আতঙ্কবাদীকে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু আপনারা ইচ্ছে করলে দেশ থেকে আতঙ্কবাদীদের দূর করে দিতে পারেন।"

"কীরকম?" প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"ভারতের সব শিশুকে যদি মাস্টারজিরা শেখায়, এই দেশ তাদের মা, আতঙ্কবাদ সেই মাকে টুকরো করে ফেলবে, তা হলে তারা বড় হয়ে আজকের মতো কারও কথায় পাগল হবে না," চোখ বন্ধ করল চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখরকে লক্ষ করল সে। নীচে একটা সুটকেস আর মাথার পাশে বড় চামড়ার থলি ছাড়া আর কোনও লাগেজ নেই। একজন সৈনিক কি সঙ্গে অস্ত্র রাখে না? ওর হাতে বা কোমরে সেরকম কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। মাথার বালিশের নীচে যদি রাখা থাকে, তা হলে আলাদা কথা। নাকি লোকটা অস্ত্র পাবে অসমে গিয়ে ওর ব্যাটালিয়ানে যোগ দেওয়ার পর।

শ্বাস ফেলল সে। এখন পশ্চিমবাংলা বা ছত্রীসগঢ়ে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় পুলিশরাই পাহাড়ে, জঙ্গলে টহল দিচ্ছে। ভারত সরকার এখানে এখনও মিলিটারি নামায়নি। যদি নামায় আর সেই ফোর্সে চন্দ্রশেখর থাকে, তা হলে কেমন হবে? এই লোকটা কি তাকে গুলি করবে? রুটি-তরকারি খাইয়েছিল বলে কি আফসোস করবে? আচ্ছা, এই মুহূর্তে না হোক, মালদা স্টেশনে ট্রেন থামতেই যদি পুলিশ কামরায় উঠে তাকে অ্যারেস্ট করে, তা হলে তাকে ট্রেনে আশ্রয় দেওয়া, খাবার খাওয়ানোর অপরাধে চন্দ্রশেখরের কি শাস্তি হবে? হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ঘুম পাচ্ছিল খুব। অভুক্ত শরীরে খাবার পৌঁছনোর পর আলস্য ছড়িয়ে পড়েছে। সে শুয়ে পড়ল। বালিশ, চাদরের দরকার হল না, পা-মাথা এক সরলরেখায় পৌঁছতেই চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল কি ভাঙল না, বোঝার আগে তার মনে হল সে শূন্যে ভাসছে। তারপরই শরীর আছাড় খেল প্রবলবেগে। আর্ত চিৎকার শুধু তার কণ্ঠ থেকেই ছিটকে এল না, অনেকগুলো চিৎকার এবং কাতরানি রাতের পৃথিবীটাকে ভয়ংকর করে তুলল। মাথায় যন্ত্রণা, হাতে, কনুইয়ের কাছে অসাড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে বুঝতে পারল কামরাটা রেললাইনের উপর নেই। চিৎকার, কান্না আরও বাড়ছিল। সে কোনওমতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই পড়ে গেল। এবং তখনই বুঝতে পারল, সে আছড়ে পড়েছিল কোনও নরম জিনিসের উপর। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ট্রেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কামরার একটা দিক উপরে উঠে যাওয়ায় মেঝেতে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ওপাশের দেওয়াল চুরমার হয়ে গিয়েছে। দু'হাতে নিজেকে ধরে রেখে সে ওই দিকে তাকাতেই একফালি চাঁদ দেখতে পেল। শীতল চাঁদ। তখনই ট্রেনের লাইনের পাশের জমিতে মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারা কী করবে বুঝতে পারছিল না। আহতদের আর্তনাদ ক্রমশ বেড়েই চলছিল।

অন্ধকারে সে হাতড়াল। তখনই সে অনুভব করতে পারল, যে বার্থে সে শুয়েছিল সেখান থেকে ছিটকে সামনের বার্থে আছড়ে পড়েও হাত-পা না ভাঙার কারণ, চন্দ্রশেখরের শরীর। ওর শরীর তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। কোনওরকমে নীচে বসে সে চন্দ্রশেখরের শরীরে হাত রাখল, "চন্দ্রজি, চন্দ্রজি...!"

কোনও সাড়া না পাওয়ায় সে হাতড়ে-হাতড়ে মানুষটার মুখ স্পর্শ করল। একটা দিকে পাশ ফিরে রয়েছে ওর মুখ। সেটাকে সোজা করতেই আবার ওপাশে ঢলে পড়ল। শরীরের যাবতীয় তীব্র যন্ত্রণা ছাপিয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। চন্দ্রশেখর কি মরে গিয়েছে? যতটুকু শক্তিতে সম্ভব সে মানুষটার শরীর ধরে ঝাঁকানো সত্ত্বেও কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

লোকটা মরে গেল? যে দেশের মাটিকে মা বলে ভাবে, তার সম্মান রক্ষা করার জন্য মিলিটারিতে এসেছিল সে, আচমকা মরে গেল? কপাল বেয়ে চটচটে তরল পদার্থ চোখের উপর গড়িয়ে আসতেই সে হাত দিয়ে সেটা মুছল। তখনই ওই মিলিটারিদের জন্য নির্দিষ্ট কামরা থেকে চাপা কান্না ভেসে এল।

এখন সে কী করবে? প্রথমেই মনে হল, বাঁচতে হবে। সে অনুমান করল এই কামরার একটা দিক উঁচু হয়ে আছে। উঁচু দিকটা যদি আবার নীচে নেমে আসে, তা হলে যে ঝাঁকুনি হবে, তা সে নিতে পারবে না। চন্দ্রশেখরের মতোই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার মনে পড়ল, এই কামরায় আরও কিছু লোক ঘুমিয়েছিল, কিন্তু মাত্র একজনের গলাই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। চোখ আবার ঢেকে যাচ্ছে চটচটে তরল পদার্থে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চাঁদটাকে দেখতে পেল। ভাঙা অংশটা দিয়ে শরীর বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু ওপাশে কী আছে তা জানা নেই। সে ধীরে-ধীরে প্রথমে দুটো পা এবং শরীর বাইরে গলিয়ে দিয়ে দু'হাতে ভাঙা দেওয়াল ধরে কয়েক সেকেন্ড ঝুলে রইল। তারপর হাত ছেড়ে দিতেই ঘাসের উপর আছড়ে পড়ল। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে। আঃ, শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল মিনিটখানেক ধরে। মাটিতে হাত রেখে বুঝল, কামরার কাছাকাছি উপর থেকে পড়লে ভয়ংকর ব্যাপার হত। সেখানে রেললাইনের পাথরের টুকরোগুলো ছড়িয়ে আছে।

জমিটা ঢালু। বুঝতে পেরে সে গড়িয়ে গেল নীচের দিকে। আর তখনই প্রবল শব্দ করে কামরাটা উপর থেকে নীচে পড়ে কাত হয়ে গেল। চাঁদের আলোয় দৃশ্যটা দেখে সে জ্ঞান হারাল।

যখন চেতনা ফিরল তখন ট্রেনলাইনের পাশে প্রচুর মানুষ। বেশিরভাগই যে গ্রামের, তা খালি গা, লুঙ্গি বা প্যান্ট দেখে বোঝা যাচ্ছিল। কামরা থেকে আহত বা মৃতদের নামিয়ে আনছে তারা। পুলিশের গাড়ির আওয়াজ কানে পৌঁছতেই পাশের বড় ঝোপটার আড়ালে চলে গেল সে। তারপরই মনে হল এখানে সে একজন আহত যাত্রী, অপরাধ যখন করেনি, তখন পুলিশকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তা হলে ভয় পাচ্ছে কেন? অবশ্য তাকে যদি আহত অবস্থায় ওই কামরা থেকে উদ্ধার করা হত, তা হলে নিশ্চয়ই মিলিটারি বলে ভাবত না। তখন প্রশ্ন উঠত, সে কীভাবে ওখানে উঠেছিল? কী উদ্দেশ্য ছিল? যদি নাম-ঠিকানা জানতে পারত, তা হলে আর দেখতে হত না। হয়তো ভেবে নিত এই ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তার সঙ্গীরা, সে বের হতে পারেনি ঠিক সময়। অথবা

মিলিটারিদের খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে ওই কামরায় উঠেছিল, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সুযোগ পায়নি। ভাগ্যিস সে কামরা থেকে ঠিক সময় বেরিয়ে এসেছিল, না হলে দ্বিতীয়বারের ঝাঁকুনিতে মারা যেতে হত অথবা পুলিশের হাতে পড়তে হত।

ভিড় বাড়ছে, আর্তনাদও। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, শুধু মাথার পাশে নয়, শরীরের অন্য কয়েক জায়গা থেকেও রক্ত ঝরছে। বাঁ হাতের কনুই এতক্ষণ অসাড় হয়েছিল, এখন সেখানে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। বোধহয় হাড় ভেঙে গিয়েছে। কোনওরকমে ওখানে গেলে, নিশ্চয়ই চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। দুর্ঘটনার পরে তো আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উঠতে গিয়ে হাঁটু কনকনিয়ে উঠল। ট্রেন থেকে নীচে পড়ার সময় হাঁটুতে যে চোট পেয়েছিল, তা এতক্ষণে মালুম হল। সে শুয়ে পড়ল আবার।

এই সময়, অন্ধকার যখন একটু পাতলা, চাঁদ যখন জোরদার, তখন ঝোপের ওপাশে কিছু নড়ে উঠল। সে মাথা ঘোরাল। এবং তখনই চাপাস্বরে কেউ বলল, ''আর এখানে থাকা উচিত হবে না। এখনও অন্ধকার আছে, চল মাঠের ভিতর দিয়ে দৌড়ই।''

দ্বিতীয় গলা বলল, ''কিন্তু অর্ডার ছিল অ্যাক্সিডেন্টের পর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। চল, পেট্রল বোমাগুলো ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দিই।''

''ধরা পড়ে যাব। ঠিক ধরা পড়ে যাব। ছুড়তে গেলে কাছে যেতে হবে।''

''তোকে অনেকক্ষণ থেকে ছুড়তে বলছি।''

''ওইরকম কান্না, চিৎকার শুনলে খারাপ লাগে না?''

''তুই থাক। আমি যাচ্ছি।''

''যাস না। আর মানুষ মারতে ভাল লাগছে না।''

''ধেৎ।''

এবার একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল সে। একটা থলে হাতে গুড়ি মেরে এগোচ্ছে। ওই লোকটা ট্রেনে আগুন ধরাতে যাচ্ছে। আহত মানুষগুলো, যারা এখনও কামরায় থেকে গিয়েছে, তারা পুড়ে মরবে। এই ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য। কিন্তু এই ট্রেনের আহত যাত্রীদের মেরে কি বিপ্লব হবে? চন্দ্রশেখরের কথাগুলো চট করে মনে আসতেই সে উঠে বসে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। এই দিকে লোকজন নেই, সবাই ওপাশে ভিড় করছে। অনেকেই ট্রেনে উঠে আহতদের নামাচ্ছে। ছায়ামূর্তিটা যখন ট্রেনের কাছাকাছি, তখন প্রাণপণ শক্তিতে, যে শক্তি তখনও শরীরে অবশিষ্ট ছিল, পাথরটা ছুড়ে দিল সে। সোজা ছায়ামূর্তির মাথার পিছনে সেটা আঘাত করতেই নিঃশব্দে পড়ে গেল একপাশে। তৎক্ষণাৎ পায়ের শব্দ হল। মুখ ঘুরিয়ে সে দেখল অন্য কণ্ঠস্বর যার ছিল, সেই ছায়ামূর্তি মাঠের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

লেংচে-লেংচে কয়েক পা এগোতেই চিৎকার কানে এল, ''এদিকে একজন আছে, তাড়াতাড়ি আসুন।''

সে মাটিতে বসে পড়ে পায়ের আওয়াজ পেল। অনেক মানুষ ছুটে আসছে তার দিকে। সে জ্ঞান হারাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে কানে এল, ''আরে, আর-একজন পড়ে আছে ওদিকে। হাত নড়ছে, এখনও বেঁচে আছে।''

যখন জ্ঞান এল, তখন দিন বা রাত সে জানে না। বড় ঘরে আলো জ্বলছিল। সে শুয়ে আছে মেঝেতে পাতা বিছানায়। মাথার পাশে স্ট্যান্ড স্যালাইনের বোতল থেকে শরীরে জল যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল তার মাথা, হাত, পা, বুক ব্যান্ডেজে মোড়া। ঝাপসা-ঝাপসা মনে হল, এখন সে হাসপাতালে।

''আপনার নাম?''

প্রশ্ন কানে যেতে চোখ খুলল সে। লোকটা পুলিশ। হাতে খাতা।

''দয়া করে নাম বলুন।''

সে চোখ বন্ধ করল। তারপর ইচ্ছে করেই বিড়বিড় করল, ''নাম?''

''নাম মনে পড়ছে না?''

সে মাথা নেড়ে না বলল।

''শুনুন, আপনি বোলপুর থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। নিউ-জলপাইগুড়ি পর্যন্ত টিকিট কেটেছেন। কিন্তু রিজার্ভেশন না থাকায় নাম-ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না,'' পুলিশ বলল, ''মনে করার চেষ্টা করুন।''

ঠিক তখনই চন্দ্রশেখরের কথা মনে পড়ে গেল। সে অস্ফুটস্বরে বলল, ''চ-চন্দ্র-চন্দ্রশেখর।''

পুলিশ নামটা লিখে নিল খাতায়, ''টাইটেল?''

সে আবার চোখ বন্ধ করতেই পিছন থেকে একটি মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল, ''মাথায় চোট পেয়ে মনে করতে পারছে না। কাল হয়তো মনে পড়ে যাবে।''

পুলিশ উঠে গেল পাশের বিছানার পাশে রাখা টুলে, ''আপনার নাম?''

''খগেন। খগেন রায়। উঃ। কী যন্ত্রণা।''

''আপনার শরীরের কোথাও চোট নেই, শুধু মাথার পিছনে লাগল কী করে?''

''জানি না। লেগে গেল। খোলা দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম!''

''টিকিট কোথায়?''

''ব্যাগে রেখেছিলাম।''

পুলিশ বলল, ''প্রচুর লুটপাট হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টের পরে। ওই অবস্থা দেখেও কী

করে মানুষ লোভী হয়! ঠিকানা বলুন।''

''মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।''

তারপর সব চুপচাপ। সে বুঝতে পারল পুলিশ এবং নার্স ঘর থেকে চলে গিয়েছে। সে মাথা ঘোরাল। লোকটা তাকে দেখল, ''নাম ভুলে গিয়েছেন?''

সে জবাব দিল না।

''আহতদের নিশ্চয়ই এক লাখ দেবে। তাই সত্যি নামটাই বললাম। বউ-বাচ্চার উপকার হবে। উঃ, পিছন থেকে এমন চোট মারল মাথায়, অবশ্য মেরে ভালই করেছে। অবশ্য টাকাটা যদি পাওয়া যায়।''

এবার কপালে ভাঁজ পড়ল তার। এই লোকটা সেই ছায়ামূর্তি, যে আগুন ধরাতে যাচ্ছিল। বলল, ''টাকার খুব দরকার?''

''কার নেই? একবার প্রচুর চোলাই খেয়েছিলাম মরে যাওয়ার জন্য। মরলেই তো সরকার টাকা দেবে। শালা মরলাম না!''

হঠাৎ তার খেয়াল হল। পেট্রলবোমা তো ঝোলায় করে এই লোকটা নিয়ে যাচ্ছিল। সেগুলো পাওয়া যায়নি? পেলে ওর পাশেই পাওয়া যেত। তা হলে নিশ্চয়ই এখানে ওকে রাখত না।

''আপনি কী করেন?'' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

''ভুলে গিয়েছি।''

''আহা রে,'' জিভে শব্দ করল লোকটা ''কিস্‌সু মনে পড়ছে না?''

''একটু-আধটু।''

''যেমন?''

''খুন করতাম। অনেক খুন।''

শোনামাত্র লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিল।

সেই রাতে চন্দ্রশেখর স্বপ্নে এল। হেসে জিজ্ঞেস করল, ''কেমন আছেন মাস্টারজি?''

''ভাল না। কিন্তু শুনুন, আমি মাস্টারজি নই।''

'সে কী?'

''আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি।''

''কিন্তু আপনি ট্রেনটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কত মানুষ আগুনে পুড়ে মারা যেত। আমরা আতঙ্কবাদীদের মেরে ফেলি দেশ বাঁচাতে, আপনি মানুষ বাঁচিয়েছেন। মানুষ নিয়েই তো দেশ,'' কথাগুলো বলেই চন্দ্রশেখর একটা চমৎকার আলোর বৃত্তে মিশে গেল। তাকে আর দেখতে পেল না সে।

দু'দিন ধরে প্রচুর জেরার সামনেও মুখ খোলেনি সে। পাশের লোকটা অনর্গল মিথ্যে বলে যাচ্ছে। সে লক্ষ করছিল পুলিশ কথাগুলো বিশ্বাস করছে। সে শুনতে পেল তাকে কলকাতার বড় হাসপাতালে ভর্তি করা হবে ভাল চিকিৎসার জন্যে। আঘাত থেকে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে বলে ভাবছে ওরা। আগামীকাল পাশের লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আনন্দে নাচছে লোকটা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল অস্বস্তিতে। চাপাগলায় উত্তেজিত কথা শুনে সে মুখ ফেরাতেই পাশের বিছানায় দু'জন মানুষকে দেখতে পেল। এখন এই ঘরে উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আধশোওয়া লোকটার পাশে উঁচু হয়ে বসা ছায়ামূর্তিকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

''তুই কী ভেবেছিস? একাই দাঁও মারবি? এ আমি হতে দেব না।''

''একদম কথা বলবি না। এরা ভেবেছে আমি ট্রেনে ছিলাম, তাই আহত হয়েছি। কিন্তু আমি জানি তুই আমাকে মারতে চেয়েছিলি।''

''আমি?''

''হ্যাঁ তুই। পিছন থেকে কিছু ছুড়ে আমার মাথা ফাটাতে চেয়েছিলি।''

''বিশ্বাস কর, মা কালীর দিব্যি, আমি কিছু ছুড়িনি।''

''ফোট, এখান থেকে ফোট। তুই ঢুকলি কী করে?''

''তক্কে-তক্কে ছিলাম। সবাই ঘুমাচ্ছে দেখে ঢুকে পড়েছি। শোন, আমি তোকে সাফ বলে দিচ্ছি, গভর্নমেন্ট যা দেবে তার অর্ধেক যদি আমাকে না দিস, তা হলে তোকে ফাঁসিয়ে দেব।''

''কীভাবে ফাঁসাবি?''

''লাইন উড়িয়ে দিয়েছিল যারা, তাদের মধ্যে তুই ছিলি। তুই মাওবাদী জানলে দশ বছর জেলে ঢুকিয়ে রাখবে।''

''আমাকে ফাঁসালে তুই বাঁচতে পারবি?'' লোকটা হিসহিস করে উঠল, ''আমি আর মাওবাদী নই। ফোট।''

সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ামূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপরে। কিছু একটা দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগল লোকটার মাথা এবং বুকে। তারপর যখন লোকটার গলা থেকে শব্দ বের হল না, তখন অস্ত্রটা ছুড়ে ফেলে দিল মেঝের উপর। শব্দ হল, গড়িয়ে এল বিছানার পাশে। ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল। চাপাগলায় বলল, ''শালা! বেইমান।''

তারপর দরজার দিকে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল।

এতক্ষণ মরার মতো পড়েছিল সে। এবার হাত বাড়িয়ে চট করে অস্ত্রটা তুলে নিতেই বুঝতে পারল, ওটা খুব ধারালো ছুরি। চট করে চাদরের তলায় ঢুকিয়ে নিল ছুরিটাকে।

দরজার কাছে গিয়ে বোধহয় ছায়ামূর্তির খেয়াল হল। আবার নিঃশব্দে ফিরে এসে উবু হয়ে দেখতে লাগল বিছানার চারপাশ। আধখোলা চোখে সে দেখল, ছায়ামূর্তি ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে ছুরি না পেয়ে। খুঁজতে-খুঁজতে এদিকে চলে এসে মেঝে হাতড়াতে লাগল। তারপর পিছন ফিরে লোকটার দিকে তাকাল। একটুও সময় নষ্ট করল না সে। যতটা সম্ভব জোরে ছুরিটার ফলা বসিয়ে দিল লোকটার ঘাড়ের নীচে। কঁক করে উঠল ছায়ামূর্তি। তারপর খসে পড়ল একপাশে।

বালিশের চাদরে ছুরিটাকে মুছল সে। হাতলটাকে ঘষে-ঘষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশের বিছানায় ফেলে দিল। তারপর কপাল এবং হাতের ব্যান্ডেজ খুলে দরজার কাছে চলে এল।

হাসপাতালে এখন বিবর্ণ আলো। পুলিশ দুটো বেঞ্চিতে গভীর ঘুমে। সে চুপচাপ বেরিয়ে এল। আকাশটার গায়ে যেন অঢেল মায়া মাখামাখি হয়ে রয়েছে। ভোর হতে এখনও দেরি। এত তারা অনেকদিন দ্যাখেনি সে। কতদিন এই সময়ের আকাশের দিকে তাকায়নি।

খানিকটা হাঁটতেই রেললাইন দেখতে পেল। কোন দিকে যাবে সে? ডান দিকেই যাওয়া উচিত। অল্প-অল্প বাতাস গায়ে লাগছে। অদ্ভুত তৃপ্তি লাগছে এখন। চন্দ্রশেখরজি, আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন? তার বিশ্বাস আবার সে স্বপ্নে চন্দ্রশেখরকে দেখবে। মুশকিল হল, ইচ্ছে করলেই স্বপ্ন দেখা যায় না।

পুলিশের খাতায় তার নাম আতঙ্কবাদী হিসেবে লেখা আছে কয়েক মাস হল। বিপ্লবের কথা শুনেছিল সে। দু'জন বেইমানকে খতম করাও তো এক ধরনের বিপ্লব। মশগুল হয়ে রেললাইনের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল সে। হঠাৎ কান ফাটানো শব্দে চমকে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একচোখো দৈত্যের মতো তার দিকে ছুটে আসছে একটা আস্ত ট্রেন।

আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেল একজন আতঙ্কবাদী।

শিল্পী: নির্মলেন্দু মণ্ডল